

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

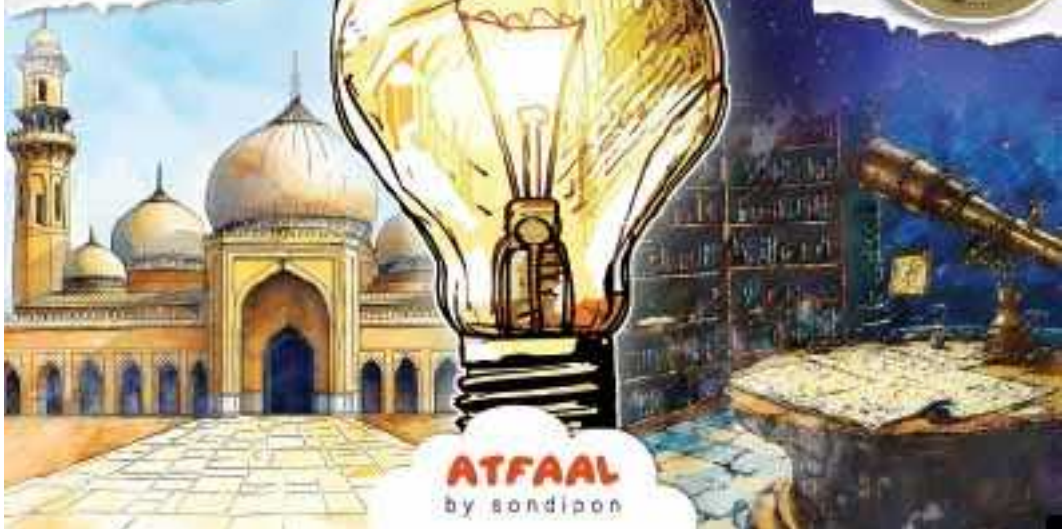
১

বয়স
৮+

সাজিদ হাসান

শিক্ষা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে

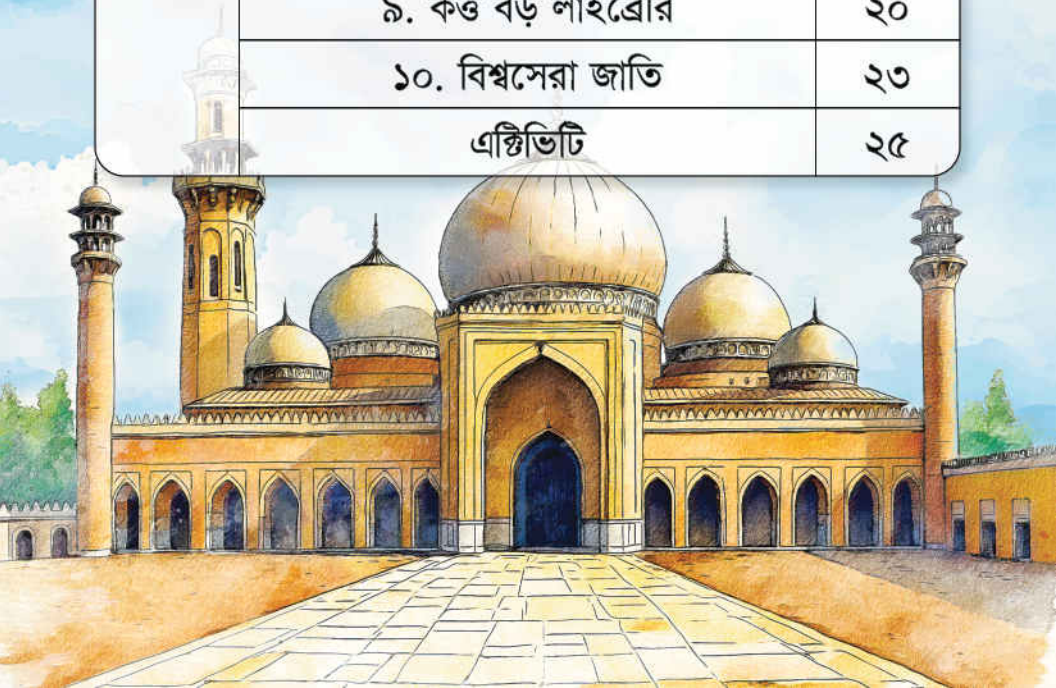
মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান



ATFAAL
by sondipon

সূচিপত্র

গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১. জ্ঞানের রাজ্যে স্বাগতম	১. সবার জন্য শিক্ষা	৬
	২. তৈরি হলো মাদরাসা	৮
	৩. সবকিছু ফ্রি-তে!	১০
	৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প	১২
	৫. সবাই পড়ে ভার্সিটিতে	১৩
	৬. কে বানাল কলমখানা?	১৫
	৭. বাইতুল হিকমাহ	১৬
	৮. রাশি রাশি স্বর্ণ উপহার	১৮
	৯. কত্ত বড় লাইব্রেরি	২০
	১০. বিশ্বসেরা জাতি	২৩
	এক্সিভিটি	২৫





গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২. চাঁদের দেশের গল্প	১. কে বানাল চাঁদ-তারাদের	২৯
	২. চাঁদের বাড়ি কই?	৩০
	৩. ওঠল দেখো রঙধনু	৩২
	৪. সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে	৩৪
	৫. চাঁদ নেমেছে কার ঘরে	৩৬
	৬. অ্যাস্ট্রোলেইব! অ্যাস্ট্রোলেইব!	৩৮
	৭. হাসে নতুন চাঁদ	৪০
	৮. চলো যাই ছায়াপথ	৪২
	৯. ঈগল পাখির ডানা	৪৪
	১০. দূর আকাশের তারা	৪৫
	এক্সিভিটি	৪৭





সকাল সাতটা বেজে ত্রিশ।

মুয়াযের মা অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু সে উঠতেই চাইছে না। শেষে মা জানালার পাশে দুটো খুলে দিলেন। পাশেই পেয়ারা গাছ। গাছের ডালে একটা দোয়েল পাখি মিষ্টি সুরে শিস দিচ্ছে।

পাখির ডাকে অবশেষে মুয়ায উঠে বসল। সকালের মিঠেকড়া রোদ ওর মুখে এসে পড়ছে। মা বললেন,

“মুয়ায, হাত-মুখ ধুয়ে দাদুভাইকে খেতে ডাকো বাবা।”

মুয়ায হাই তুলতে তুলতে বলল, “দাদুভাই কোথায় মা?”

“লাইব্রেরিতে।”

মুয়াযের দাদু আব্দুল মুত্তালিব। রোজ সকালে নিজের লাইব্রেরিতে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটান। ফজরের পর এক ঘণ্টা কুরআন পাঠ করেন। তারপর লাইব্রেরিতে অন্যান্য যেসব বই আছে, সেগুলো থেকে নিজের পছন্দমতো বই নিয়ে পড়তে থাকেন। মুয়ায সুযোগ পেলেই লাইব্রেরিতে গিয়ে দাদুর সাথে সেখানে গল্প জুড়ে দেয়।

কিন্তু আজ তো স্কুল বন্ধ। তাই সে আলসেমি করে ফজরের পর আরেকটু ঘুমিয়ে নিয়েছে।



“দাদুভাই! ও দাদুভাই!”

মুয়ায ডাকতে ডাকতে লাইব্রেরিতে যায়। দাদুর লাইব্রেরিটা অনেক সুন্দর। ইয়া বড় বড় বইয়ের তাক। তাকগুলোতে কত মোটা মোটা সব বই! আর পুরো লাইব্রেরি জুড়ে কী যে সুন্দর আতরের ঘ্রাণ! ওর মনটাই ভরে যায় খুশিতে।

মুয়ায দেখতে পায়, টেবিলে বিশাল বিশাল বই সামনে নিয়ে ওর দাদু বসে আছেন।

“আসসালামু আলাইকুম, মুয়ায। অবশেষে ঘুম ভাঙল তোমার?” দাদু জানতে চাইলেন।

“ওয়া আলাইকুম আসসালাম, দাদু। হ্যাঁ, হিহিহি। শোনো দাদু, মা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে। খাবে চলো।”

দাদু মুচকি হাসলেন। বললেন,

“একটু অপেক্ষা করো। বইটার আর দুই পাতা বাকি আছে। এটুকু পড়েই দুজন খেতে যাব, কেমন?”

মুয়ায দেখতে পায়, একটা পুরোনো ধাঁচের বই দাদুর সামনে খোলা। দাদু যে কত বই পড়তে পারে! সে বলল,

“দাদুভাই, এখন তো স্কুল ছুটি। ছুটি শেষে আমাদের ক্লাসে আব্দুল্লাহ স্যার একটা রচনা প্রতিযোগিতা নেবেন। সেখানে সবাই নিজের ইচ্ছেমতো লিখতে পারবে। আমি যে কী লিখব, কিছুই বুঝতে পারছি না!”

“হাহাহা। এটা কোনো ব্যাপার হলো! তুমি মুসলিম বিজ্ঞানীদের পৃথিবী বদলে দেওয়া আবিষ্কার নিয়ে সুন্দর একটা রচনা লিখে ফেলো। দেখবে, তোমার রচনা সবার চাইতে সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ।”

“মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার? কিন্তু, আমি তো এ সম্পর্কে কিছুই জানি না!” মুয়ায অবাক হয়ে কান চুলকায়।

আব্দুল মুত্তালিব সাহেব হাসলেন। বললেন, “জানতে চাও? তাদের অনেক মজার মজার গল্প আছে। শোনো তবে।”





“আমাদের নবিজি ﷺ-এর ওপর সবার প্রথম কী আয়াত নাযিল হয়েছিল, জানো?

সেখানে আল্লাহ বলেন,

‘পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’

(সূরা আলফা, ৯৬ : ১)

আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ তাই ইলম শিক্ষা ও লেখাপড়া করতে বলতেন। জানো, রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায়ে গেলেন, তখন তিনি সেখানে মসজিদগুলোতে মুসলিমদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সে-সময় মসজিদই ছিল মুসলিমদের স্কুল। যেখানেই মসজিদ, সেখানেই পড়ালেখা। আমাদের নবিজি কী বলেছেন জানো? তিনি বলেন,

‘প্রত্যেক (পুরুষ কিংবা নারী) মুসলিমের ওপর ইলম অর্জন করা ফরজ।’ (সুনায়ে ইবনু মাজাহ, ২২৪)

তাই দাদুভাই, একজন ভালো মুসলিম হওয়ার জন্য লেখাপড়া, ইলম ও জ্ঞান অর্জন খুবই জরুরি।”

মুয়ায মাথা নাড়ে। লেখাপড়া করতে ইসলাম এত উৎসাহ দিয়েছে!

দাদু বলেন, “নবিজি অনেক সাহাবিকে বিভিন্ন এলাকায় কুরআনের শিক্ষক হিসেবে পাঠাতেন।



তাদেরকে বলা হতো আহলুল ইলম বা জ্ঞানী ব্যক্তি। মানুষকে তারা ইসলামের শিক্ষা দিতেন।

নবিজির আমলে মুসলিমরা শিক্ষাকে অনেক মর্যাদা দিতেন। যিনি যত বেশি ইলম, আমল ও জ্ঞান রাখতেন, তিনি তত বেশি সম্মানিত ছিলেন। সকল মুসলিম তাকে শ্রদ্ধা করতেন। ভালোবাসতেন।”

“তার মানে, মুসলিমরা নবিজির সময় থেকেই পড়াশোনা করে আসছে?”
“ঠিক ধরেছ।

নবিজি মদীনাতে মসজিদভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে মুসলিমরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিমরা যেখানেই যেত, সেখানেই পড়ালেখার ব্যবস্থা করত।

আজ থেকে এক হাজার একশ বছর আগে তুমি মুসলিম বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় গেলে দেখতে পেতে—মসজিদে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মন দিয়ে পড়াশোনা করছে।”

“তা-ই! আচ্ছা দাদু, ওই সময় কি সবাই ছোট থাকতেই পড়াশোনা শুরু করত?”

“হ্যাঁ। তোমরা এখন যেমন শৈশবে স্কুলে যাওয়া শুরু করো। তখনকার বাচ্চারাও তেমনি ছয় বছর বয়স থেকে মক্তবে পড়তে যেত।”





“আচ্ছা দাদু, তখনকার মক্তবগুলো কেমন ছিল?”

আব্দুল মুভালিব সাহেব ওর প্রশ্ন শুনে খুশি হয়ে বলেন,

“তখন মক্তবগুলো থাকত মসজিদের ভেতর। সেখানেই সবাই পড়ালেখা করত।

কিন্তু, এক হাজার সালের দিকে ইরাকের বাগদাদ নগরে নিয়াম আল-মুলক নামে একজন শিক্ষক একটি মাদরাসা তৈরি করেন। এটির নাম ছিল ‘নিয়ামিয়াহ মাদরাসা’। সেটি ছিল মসজিদ থেকে আলাদা। এটিই ছিল মসজিদের বাইরে প্রথম মাদরাসা।”

মুয়ায জানতে চাইল, “দাদু, তখন কি মাদরাসায় আমাদের স্কুলের মতো এত বই থাকত?”

দাদু হেসে বললেন,

“তখন প্রতিটি মাদরাসার পাঠাগারে অসংখ্য বই ছিল। পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা-সহ কঠিন কঠিন সব বিষয়ে অনেক বই থাকত।”

মুয়ায গালের নিচে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। কত শত চিন্তা যে ওর মাথায় আসে। সে দাদুকে বলে,

“ভূমম! আচ্ছা, সেই সময় মাদরাসাগুলোতে কী কী বিষয় পড়ানো হতো?”



দাদু বলেন,

“তখন মুসলিমদের পড়ালেখার জন্য চার ধরনের মাদরাসা বা স্কুল ছিল।

এক. প্রাথমিক শিক্ষার মাদরাসা;
দুই. উচ্চ শিক্ষার মাদরাসা;
তিন. হাদীস শিক্ষার মাদরাসা,
সেখানে দ্বীনি ইলম শেখানো হতো;
আর চার. চিকিৎসাবিদ্যার মাদরাসা বা স্কুল।

সকল মুসলিমরা এসব শিক্ষালয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো, সুবিধামতো পড়তে পারত।”

মুয়ায একটু ভাবে। তারপর দাদুকে আবার জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা দাদু, তখন কি সকলেই পড়ালেখা করত? নাকি অল্প কয়েকজন পড়ত?”

“শোনো দাদুভাই। আল্লাহ তো কুরআনে সবাইকে পড়তে বলেছেন। তাই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলিমের ওপর ফরজ।

সেজন্য মুসলিম শিক্ষকরা সব বয়সের সকল মানুষকেই শিক্ষা দিত। সবাই কিছু না কিছু পড়াশোনা করত।

শিক্ষাবিদ E. H. Wilds কী বলেছেন জানো?”

“কী?”

“তিনি বলেন, মুসলিমদের মাঝে লিখতে-পড়তে পারে না, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া ছিল খুব কঠিন।”

মুয়ায অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে।



৩. ছবি অঙ্কন করো (খাতায়)

ক. মদীনা

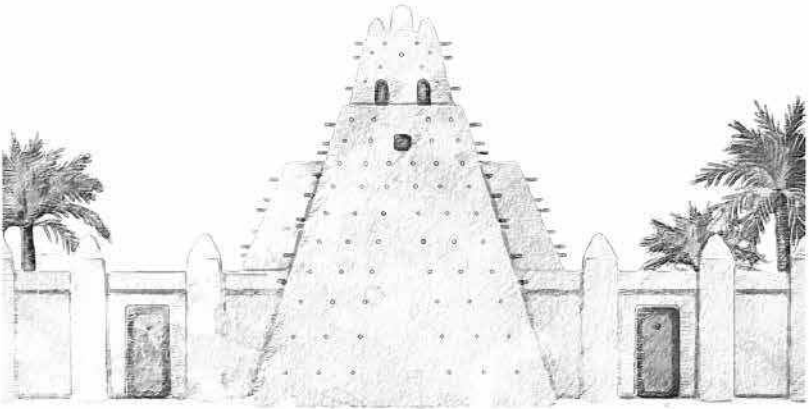
খ. মাদরাসা

গ. মসজিদ

ঘ. ফাউন্টেন পেন

ঙ. পুরোনো বইয়ের লাইব্রেরি

৪. রঙ করো



ছবি : মালির সান্ধারে মসজিদ

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

২

বয়স
৮+

সাজিদ হাসান

চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং নগর-বিজ্ঞানে

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান



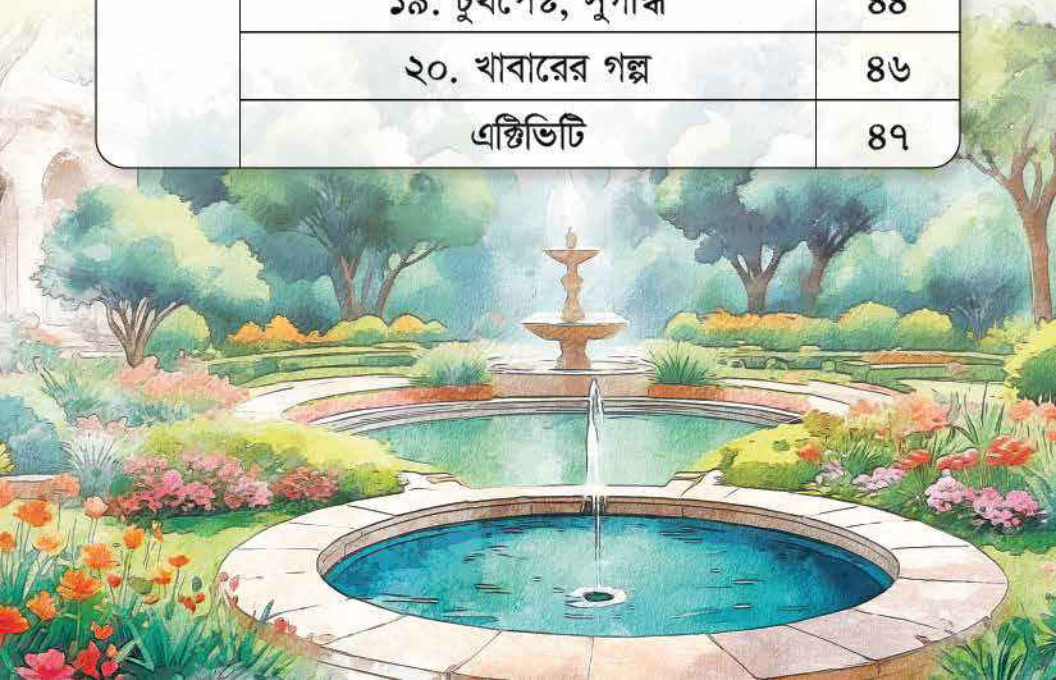
ATFAAL
by sondipon

সূচিপত্র

গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১. ডাক্তার হাতিয়া	১. অসুস্থদের সেবায় মুসলিম	৫
	২. বানাল প্রথম হাসপাতাল	৭
	৩. বিনামূল্যে চিকিৎসা	৯
	৪. বানাল প্রথম মেডিকেল স্কুল	১০
	৫. বিশ্বসেরা ইবনে সিনা	১২
	৬. যাহরাভির সার্জারি	১৪
	৭. সার্জারি কিভাবে করে?	১৬
	৮. সারিয়ে দিলো চোখের রোগ	১৮
	৯. সুস্থ হওয়ার টিকা	২০
	১০. এক চামচ দুই বেলা	২২
	এক্সিভিটি	২৪



গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২. ফুলে ভরা এ নগরে	১১. হাজার বছর পুরোনো এসি	২৮
	১২. শহরে কত সুবিধা!	৩০
	১৩. জান্নাতের বাগান	৩২
	১৪. মসজিদে অনন্য নকশা	৩৪
	১৫. সেরা মুসলিম স্থপতি	৩৬
	১৬. গম্বুজের গল্প	৩৮
	১৭. নকশায় বিজ্ঞান	৪০
	১৮. রঙ-বেরঙের কার্পেট	৪২
	১৯. টুথপেস্ট, সুগন্ধি	৪৪
	২০. খাবারের গল্প	৪৬
	এক্সিভিটি	৪৭





গল্প : ১

এক যে ছিল হাসপাতাল



সকাল থেকে মুয়ায খুকখুক করে কাশছে। কিছুতেই কাশি থামছে না। তা দেখে মা ওকে আদা-চা বানিয়ে দিলেন। মুয়ায চায়ের কাপ হাতে সোজা চলে গেল দাদুর লাইব্রেরিতে।

সেখানে দাদু তার প্রিয় চেয়ারে বসে আছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন। মুয়ায দাদুর সামনের একটা চেয়ারে বসে বলল,

“আসসালামু আলাইকুম, দাদু। খুকখুক। কী বই পড়ছো? খুকখুক।”

তার এ হাল দেখে দাদু কষ্ট পেলেন, “ওয়া আলাইকুম আসসালাম। মেডিসিনের ওপর একটা বই পড়ছি। তা, এত সর্দি কিভাবে লাগল মুয়ায?”

“কাল রাতে একটু আইসক্রিম খেয়েছিলাম।”
জোরে নাক টেনে বলল মুয়ায।

“মা কিছু বলেনি?”

“উহু। শুধু একটু বকা দিয়েছে। হিহিহিহি

।” সে ফিক করে হেসে দেয়।

দাদু ওর দিকে একটা টিস্যু এগিয়ে দিলেন। বললেন, “মুয়ায, মুসলিম বিজ্ঞানীরা কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও অনেক অবদান রেখেছেন। তা কি তুমি জানো?”

নাক মুছতে মুছতে সে দাদুর দিকে তাকাল, “না তো দাদু। বলো তো শুনি।”
“তাহলে আমার জন্যও এক কাপ মশলা চা নিয়ে আসো। চা খেতে খেতে মজা করে গল্প করা যাবে।”



মুয়ায মা-কে বলে চা নিয়ে আসল। লেবু, আদা, এলাচ, দারুচিনি আর লবঙ্গ দিয়ে মজাদার মশলা চা। কাপ হাতে জাঁকিয়ে বসে দাদু বলতে শুরু করলেন,

“প্রায় এক হাজার বছর আগের কথা। ইউরোপে তখন মানুষের অবস্থা খুব করুণ। রোগে-শোকে, মহামারিতে তারা অনেক কষ্ট করত। কিন্তু ভালো চিকিৎসা পেত না। কারণ, ইউরোপের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

সেই সময়ে মুসলিম বিশ্বের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর সবচাইতে আধুনিক। মুসলিমদের অঞ্চলের পথেঘাটে সবখানে ফার্মেসি (ঔষধালয়), হাসপাতাল, মেডিকেল স্কুল খুঁজে পাওয়া যেত।

এমনকি, ওইসময় মানুষ যেমন চিকিৎসা সেবা পেত, এখনো পৃথিবীর কোথাও এত সুযোগ-সুবিধা নেই।”

“আরেকটু বুঝিয়ে বলো তো দাদু?” মুয়াযের আগ্রহ বাড়ে।

“শোনো। মুসলিমদের আগমনের আগে পৃথিবীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না।



তখন মানুষ শুধু প্রার্থনা করত, যেন অলৌকিক জাদুবলে তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়। এটাই ছিল তাদের ভরসা।

কিন্তু এভাবে তো রোগ ভালো হবে না। ধরো, কারও ক্যান্সার হলো। কিন্তু তার রোগ কী, সেটা কেউ বের করতে পারল না। তাহলে কি কেউ তার চিকিৎসা করতে পারবে?”

“না তো।”

“মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীতে প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগ শনাক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। ফলে হাসপাতালে যথাযথভাবে রোগের চিকিৎসা করা আরম্ভ হলো।”

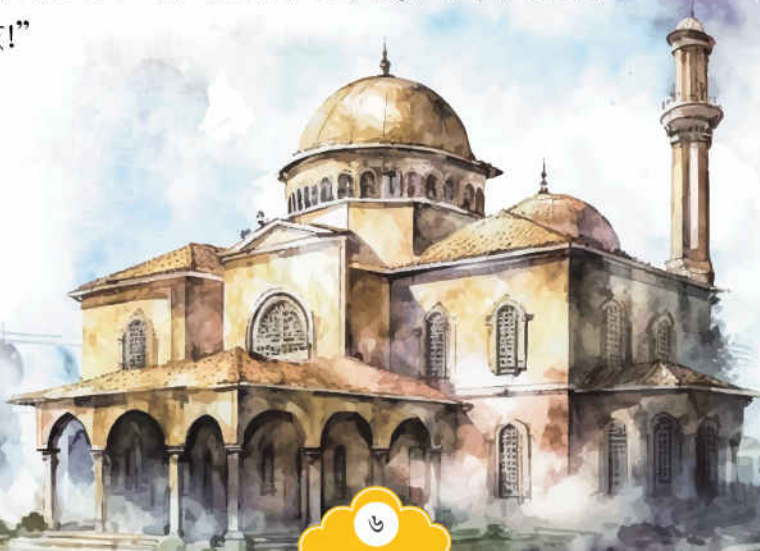
“সুবহানআল্লাহ!”

“হাজার বছর আগে ইউরোপে যখন মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত, তখন মুসলিম বিশ্বে শাসকরা হাসপাতাল তৈরির প্রতিযোগিতা করত। তারা সেসব হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করত।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ঔষধ দিয়ে মানুষদের চিকিৎসা করতেন। তাই, কেমিক্যালের বাজে প্রভাব থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা ছিল মুক্ত।

শুধু তা-ই নয়। তখন মুসলিমদের হাসপাতালে নারী এবং পুরুষদের পর্দা রক্ষার্থে আলাদা করে চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। পুরুষদের জন্য ছিল পুরুষ ডাক্তার। আর নারীদের জন্য ছিল মহিলা ডাক্তার।”

“বাহ!”





“গম্বুজ কী, দাদুতাই?” মুয়ায ধাঁধায় পড়ে।

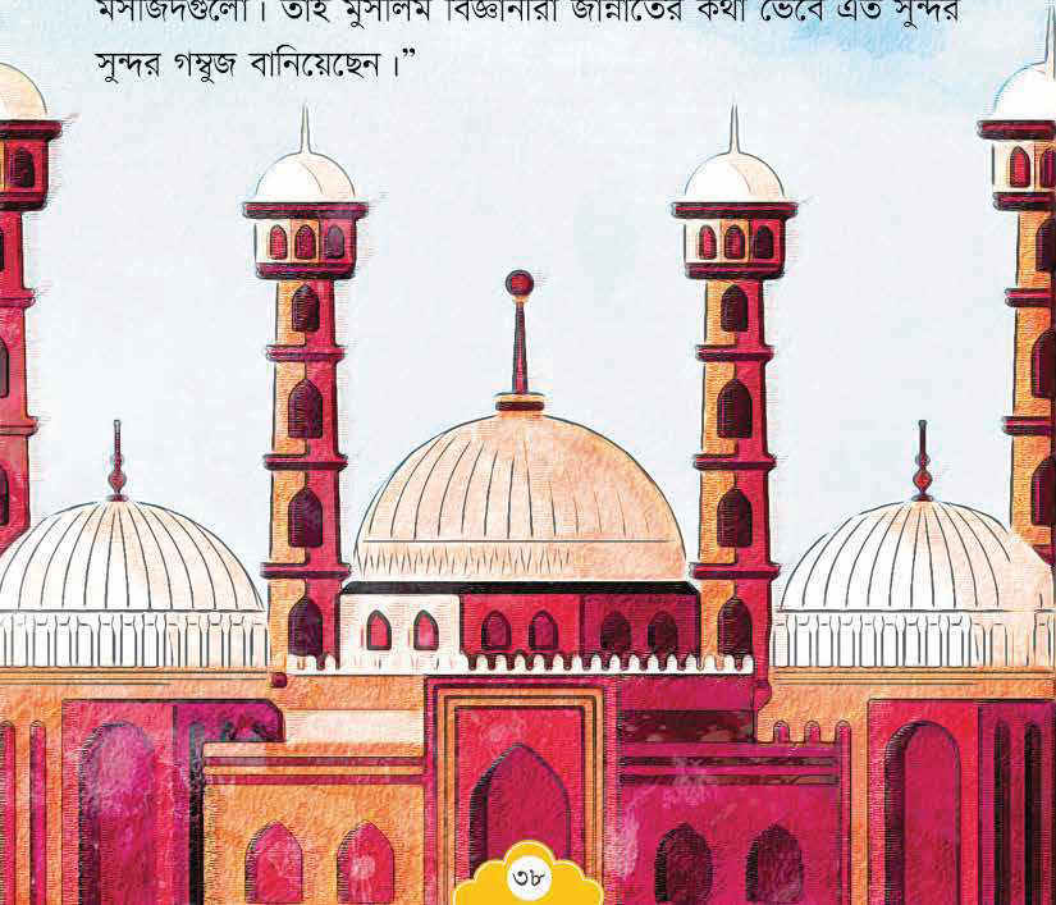
“মসজিদের ওপরের যে গোলাকার অংশটি থাকে, তাকে গম্বুজ বলে। আমাদের মসজিদের ওপরও তো আছে। দেখোনি?”

“হ্যাঁ! দেখেছি তো। সুন্দর। গোল।”

“গম্বুজ শুধু গোলই হয় না। আরও অনেক রকম হয়ে থাকে। যেমন ধরো, অর্ধ বৃত্তাকার বা পিঁয়াজের মতো। মুসলিম বিজ্ঞানীরা গম্বুজকে আরও অনেকভাবে তৈরি করেছেন। সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করেছেন।

আমাদের আল্লাহ সুন্দর। তাই তিনি সুন্দর পছন্দ করেন।

তা ছাড়া আরশের ছাদ হলো জান্নাত। আর পৃথিবীর জান্নাত তো মসজিদগুলো। তাই মুসলিম বিজ্ঞানীরা জান্নাতের কথা ভেবে এত সুন্দর সুন্দর গম্বুজ বানিয়েছেন।”



“বাহ! দাদুভাই, এমন সুন্দর সুন্দর কয়টা গম্বুজের গল্প বলো না!”

“সবচেয়ে বিখ্যাত হলো আমাদের প্রাণের রাসুলের মসজিদ—মদীনার ‘মসজিদে নববী’র গম্বুজ। কত কোটি কোটি মুসলিম যে সেই সবুজ গম্বুজের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়, তার হিসেব একমাত্র আল্লাহই জানেন। মসজিদে আকসার সোনালি গম্বুজও মুসলিম উম্মতের অন্যতম প্রিয়। তার সোনালি রঙ দেখে মুসলিমদের মন আকুল হয়। রাত জেগে জেগে তারা ভাবে, কবে যেতে পারব উম্মতের প্রথম কিবলায়।”

“কেন দাদু? যেতে পারে না কেন?”

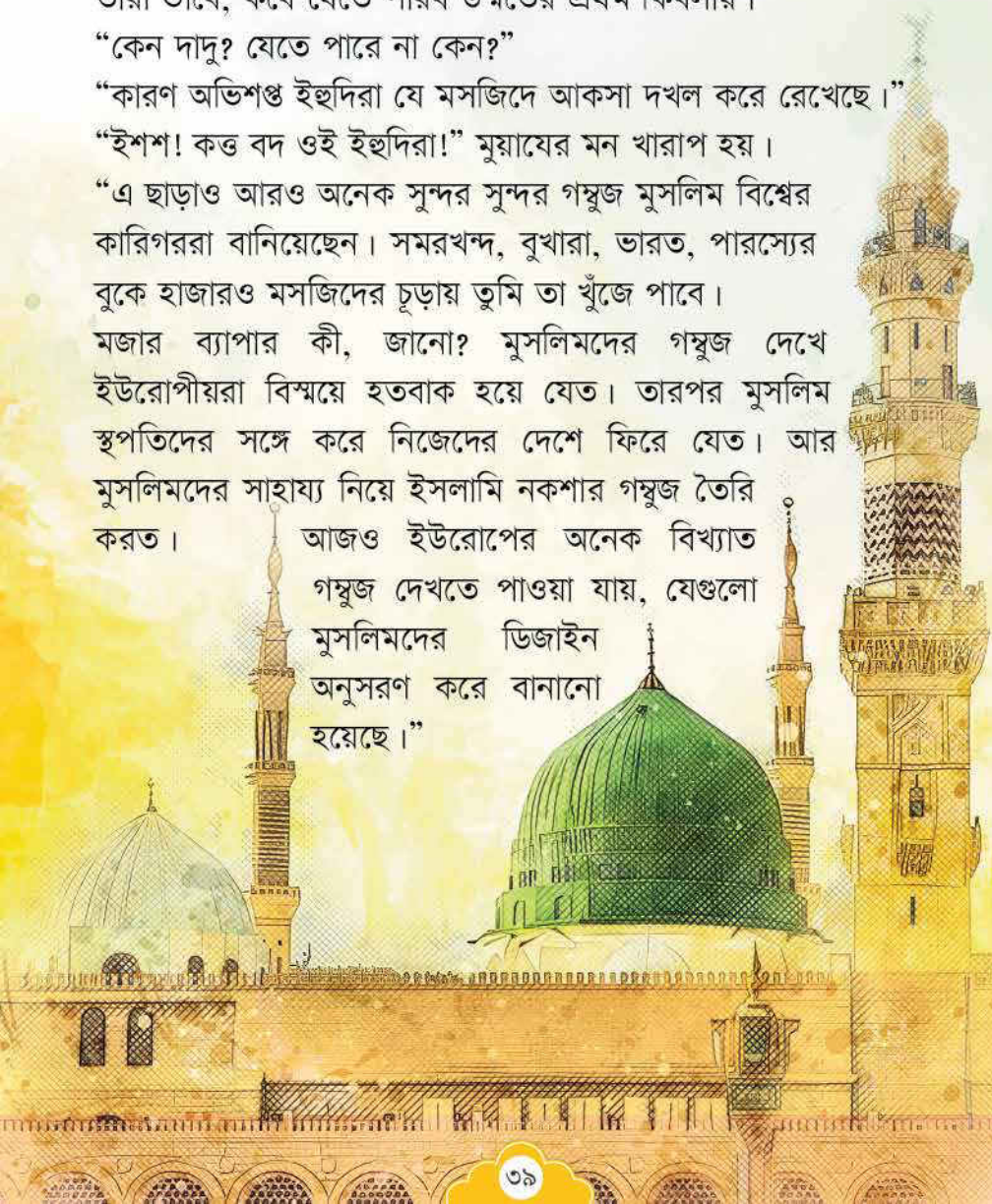
“কারণ অভিশপ্ত ইহুদিরা যে মসজিদে আকসা দখল করে রেখেছে।”

“ইশশ! কত্ত বদ ওই ইহুদিরা!” মুয়াযের মন খারাপ হয়।

“এ ছাড়াও আরও অনেক সুন্দর সুন্দর গম্বুজ মুসলিম বিশ্বের কারিগররা বানিয়েছেন। সমরখন্দ, বুখারা, ভারত, পারস্যের বৃহৎ হাজারও মসজিদের চূড়ায় তুমি তা খুঁজে পাবে।

মজার ব্যাপার কী, জানো? মুসলিমদের গম্বুজ দেখে ইউরোপীয়রা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তারপর মুসলিম স্থপতিদের সঙ্গে করে নিজেদের দেশে ফিরে যেত। আর মুসলিমদের সাহায্য নিয়ে ইসলামি নকশার গম্বুজ তৈরি করত।

আজও ইউরোপের অনেক বিখ্যাত গম্বুজ দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো মুসলিমদের ডিজাইন অনুসরণ করে বানানো হয়েছে।”



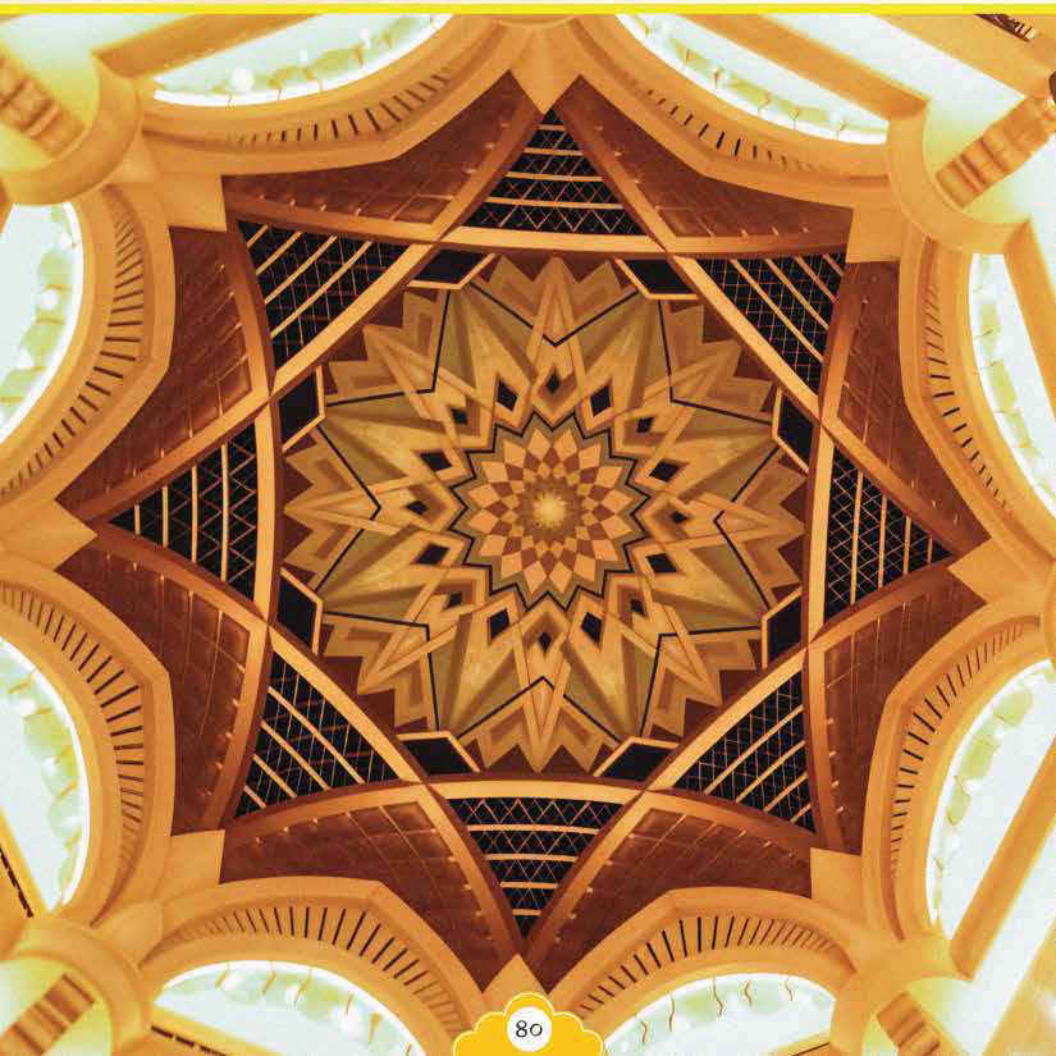


“মুসলিম বিজ্ঞানীরা আর কী কী করেছে দাদুভাই?”

“শোনো তাহলে। তোমার বড় আপুকে জ্যামিতি পড়তে দেখেছ কখনো?”

“হ্যাঁ। দেখেছি তো। আপু পেন্সিল আর স্কেল নিয়ে বসে বসে আঁকে।”

“মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের ডিজাইনে জ্যামিতি ব্যবহার করত। শুধু জ্যামিতিই নয়। গণিত, আকার ও নকশা—এসব মিলিয়ে তারা স্থাপত্যবিদ্যাকে এক নতুন রূপ দেয়।”



মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

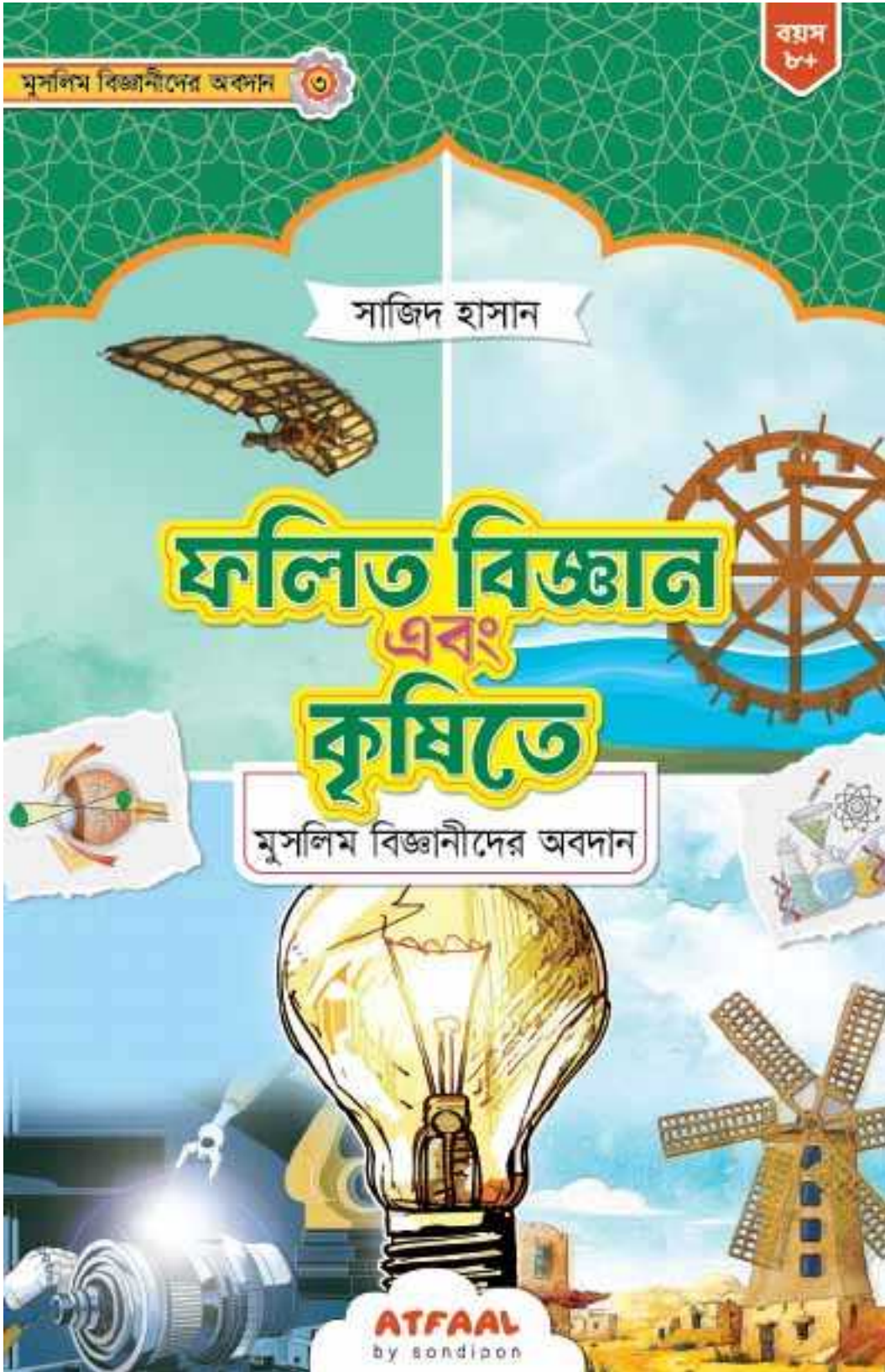


বয়স
৮+

সাজিদ হাসান

ফলিত বিজ্ঞান এবং কৃষিতে

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান



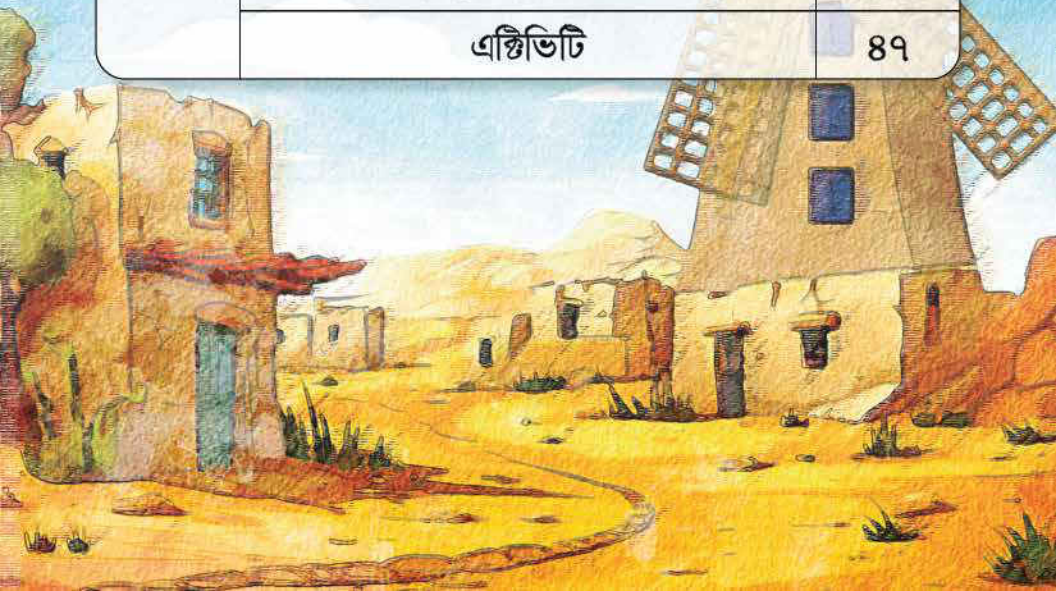
ATFAAL
by sondipon

সূচিপত্র

গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১. দূর আকাশের ভস্মীম নীলে	১. উড়ছে দেখো দুঃসাহসী	৬
	২. লেজের তেজ!	৯
	৩. উড়ন্ত সেলেবি	১০
	৪. চোখের রহস্য	১২
	৫. পরীক্ষা! পরীক্ষা!	১৪
	৬. দেখব গোটা জগৎটাকে	১৬
	৭. বেলা বয়ে যায়	১৮
	৮. হাতির পিঠে ঘড়ি	২০
	৯. মুসারা ছিলেন তিন ভাই	২১
	১০. আল-জাযারির রোবট মেশিন	২৩
	এক্সিভিটি	২৫



গল্প	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২. মুন্সীর স্বপ্নেরা	১. মাঠ ভরা ওই সোনার ফসল	২৮
	২. মরুর বুকে পানির জোয়ার	৩০
	৩. চঞ্চল বাতাসখানি	৩২
	৪. সবকিছু ন্যাচারাল	৩৪
	৫. থাকব না'কো বন্ধ ঘরে	৩৬
	৬. অন্ধের প্যাঁচ	৩৯
	৭. শূন্যের দাম কত?	৪১
	৮. রসায়নের রস	৪২
	৯. সুগন্ধি ছড়াল আল-রাযি	৪৪
	১০. শেষের শুরু	৪৫
	এক্সিভিটি	৪৭





গল্প : ১

দূর আকাশের অসীম নীলে



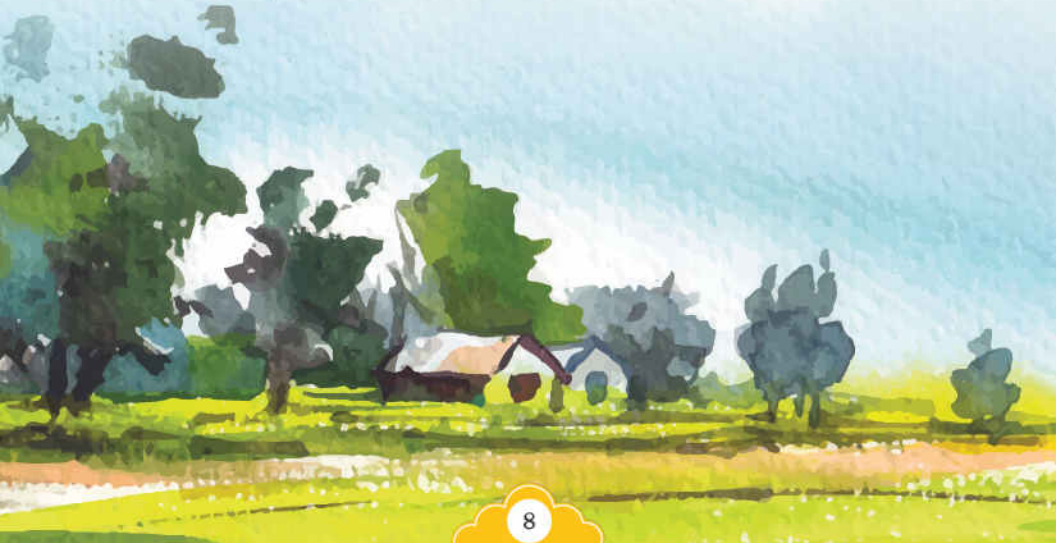
আসরের পর মুয়ায ও তার দাদু মাঠে হাঁটতে বের হয়েছে। ফুটবল ফিল্ডে গ্রামের ছেলেরা খেলা করছে। আকাশে হালকা মেঘ। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। সে বাতাস পেয়ে অনেক কিশোর দূর আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছে। ঘুড়িদের দল আঁকাবাঁকা হয়ে ডানে বামে দোল খাচ্ছে। মুয়ায চিৎকার করে দাদুকে ডাকল, “দাদু দাদু! ওই দেখো ঘুড়ি উড়ছে! আমাকেও একটা ঘুড়ি কিনে দাও!”

দাদু হেসে বললেন, “তুমি ঘুড়ি উড়াতে পারো?”

“পারি না তো। কিন্তু কী হয়েছে। শিখে নেবো ইনশাআল্লাহ।”

হঠাৎ উত্তর আকাশ থেকে কিসের যেন গর্জন শোনা গেল। একটু পর সেখানে দেখা গেল ছোট এক বিমান। তারপর ধীরে ধীরে ছোট বিমানটা অনেক বড় হয়ে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

তার সে কী শব্দ! মুয়াযের কানে যেন তালা লেগে যাবে শব্দে।



সে দুহাতে কান চেপে ধরে তাকিয়ে দেখে, সেটা দূরে চলে গেছে।
বিমানটা আবারও ছোট হয়ে গেল।

“আচ্ছা দাদু, এত ছোট
প্লেনে কী করে মানুষ থাকে?”

ওর কথা শুনে দাদু হাসলেন। বললেন, “আকাশে প্লেন ছোট মনে হলেও,
বাস্তবে কিন্তু তা অনেক বড়।”

মুয়ায খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, “দাদু,
আমার না আকাশে উড়তে খুব ইচ্ছে করছে।”

দাদু চমকে গেলেন। বললেন, “কিভাবে উড়তে ইচ্ছে করছে?”

মুয়ায বিপদে পড়ে গেল। উড়তে ইচ্ছে করলেই তো হলো

না। উপায়ও তো জানা লাগবে। অনেকক্ষণ ভেবে সে
বলল, “উমমমম...ঘুড়ির লেজ ধরে উড়তে পারব না?”

“হাহাহা! তুমি তো দেখছি আব্বাস ইবনু ফিরনাস হয়ে যাচ্ছ
দাদুভাই।”

“ইনি আবার কে!” মুয়ায ধাঁধায় পড়ে যায়।





“বহুকাল আগে থেকেই মানুষ আকাশে উড়ার
স্বপ্ন দেখত। পাখি যখন উড়ে যেত, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।
ভাবত, তারাও পাখির মতো ডানা মেলে উড়বে।

যেমন ধরো, মিশরের মানুষেরা কল্পনা করত, মানুষেরা পাখির মতো
ডানা দিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। চীন, গ্রিস-সহ বহু অঞ্চলের
কল্পকাহিনিতে উড়ন্ত মানুষের গল্প আছে।

স্বপ্ন তো সবাই দেখেছে। কিন্তু স্বপ্নকে সবার প্রথম বাস্তব করতে চেয়েছে
কে, বলো তো দেখি?”

“কে দাদু?” মুয়াযের গলায় কৌতূহল।

“তার নাম আব্বাস ইবনু ফিরনাস। নিজ ঘরে
যে মহাকাশ বানিয়েছিল এক বিজ্ঞানী, তার গল্পটা মনে
আছে?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ!” মুয়াযের মনে পড়ে যায়।

“মহাবিজ্ঞানী আব্বাস ইবনু ফিরনাস-এর জন্ম ছিল মুসলিম স্পেনে। তিনি
একইসঙ্গে একজন কবি, জ্যোতির্বিদ ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তবে তার
সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হলো উড়ার যন্ত্র আবিষ্কার।”





দাদু হেসে বলেন,

“মুসলিমরা তো অনেক ফসল ফলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করল। কিন্তু, বেশি ফসল ফলাতে বেশি করে পানি সেচ দিতে হয়।

অথচ মুসলিমরা যেসব এলাকায় বসবাস করত, তার বেশির ভাগই ছিল মরুভূমি। তাই পানি পাওয়া ছিল খুবই কষ্টকর।

তখন বিজ্ঞানীরা কী করল জানো? তারা মাটির গভীর থেকে পানি তোলার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলল।

মুসলিমদের পানি তোলার কল বা মেশিনের নাম ছিল নোরিয়াস। একসময় শুধু স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া শহরেই আট হাজার নোরিয়াস তৈরি করা হয়েছিল।”

“আট হাজার! আল্লাহ্ আকবার!”

“বিজ্ঞানী আল-জাযারি পানি তোলার নতুন মেশিন আবিষ্কার করেন। এই মেশিনে তিনি নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করলেন।

তখনকার মানুষ এত আধুনিক টেকনোলজি দেখে অবাক হয়ে ভাবত, এ নিশ্চয়ই জাদু!”



“হাহাহা! কত বোকা মানুষ।”

“বোকা না মুয়ায। তার বানানো মেশিন হাতের কোনো স্পর্শ ছাড়াই অনেক অনেক পানি তুলতে পারত। সাতশ বছর আগে এত আধুনিক মেশিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।”

“ওওও...” মুয়ায বিষয়টা বুঝতে পারে।

“কিন্তু, একটা সমস্যা দেখা দিলো।”

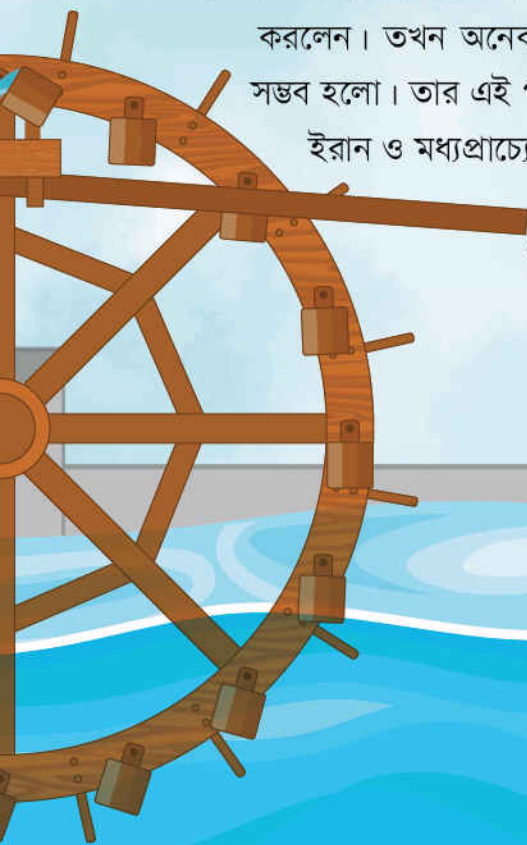
“কী সমস্যা দাদু?” মুয়াযের কৌতূহল হয়।

“মরুভূমির সবখানে মাটি খুঁড়লেও পানি পাওয়া যেত না। তখন বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ আল-কারাজি কী করলেন জানো?”

“কী করলেন?”

“তিনি মাটি বা মরুবালির নিচে দিয়ে পানি বহন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তখন অনেক দূর পর্যন্ত পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো। তার এই পদ্ধতির নাম হলো ‘কানাত’। আজও ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অঞ্চলে ‘কানাত’ পদ্ধতিতে পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।”

“সুবহানআল্লাহ!”



“হ্যাঁ। খলিফা উমর রা.-এর সময়ে ইরানের এক ব্যক্তি এসে বললেন, তিনি এমন কল বানিয়ে দিতে পারবেন—যা বাতাস দিয়ে চলে। তখন উমর রা. তাকে দিয়ে এমন একটি কল বানিয়ে নিলেন।

তখন থেকে মুসলিমরা বায়ুকলের ব্যবহার বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এই কল দিয়ে মুসলিমরা ভুট্টা গুঁড়ো করত। আখের রস বের করত। সেচ কাজের জন্য পানি তুলত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার।”

দাদু একটু থেমে আবার বললেন,

“বাতাস বইলে এই পাখাগুলো নিজ থেকেই ঘুরতে পারে। তখন পাখা থেকে পাওয়া শক্তি কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করা হয়। এমনকি বিদ্যুৎও উৎপাদন করা যায়।”

মুয়ায অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে থাকে।

বাতাস দিয়ে এত কিছু করা যায়!

